ভারতবর্ষের ঐক্য এবং বৈচিত্র্য
(Unity And Diversity In India)

ভারতবর্ষের ঐক্য এবং বৈচিত্র্য সম্পর্কে নানাবিধ 'জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যা' আছে। এসব ব্যাখ্যার সারবস্তুকে বিশ্লেষণ করলে তাতে ঐক্যের ওপর আলোকপাত করার এক ধারাবাহিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের মতে, এটা অনেক পরিমাণে 'উপনিবেশবাদী তত্ত্বের'ই প্রতিক্রিয়া। উপনিবেশবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী ভারতবর্ষ ছিল পারস্পরিক বিদ্বেষ ও বিভেদে দীর্ণ এক দেশ। এই দেশে শৃঙ্খলা ও সংহতি আনার জন্য ঔপনিবেশিক শক্তির হস্তক্ষেপ অপরিহার্য। ব্রিটিশরা শাসকশক্তি হিসেবে ভারতে থাকার স্বপক্ষে এ ধরনের মতামতকেই সবচেয়ে জোরালো যুক্তি হিসেবে উপস্থিত করেছিল। সাবেকি জাতীয়তাবাদী তত্ত্ব এই যুক্তিকে খারিজ করে প্রমাণ করতে চাইল যে ভারতীয় সমাজে ঐক্যকে রক্ষা করার জন্য ঔপনিবেশিক শাসকদের হস্তক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন। এই মত অনুযায়ী বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজে একটা মূলগত ঐক্য আছে। ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরে প্রবহমান এই ঐক্যমুখী প্রবণতা। সমাজতাত্ত্বিক এস. সি. দুবের মতে, ভারতীয় সমাজের যে বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে তা হল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। বহু ব্যবহারে জীর্ণ এই বাক্যবন্ধটিই ভারতবর্ষের আত্মপরিচয়ের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

❑ ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের উৎস (Sources of Diversity)

সহজ কথায়, বৈচিত্র্য বলতে পার্থক্য বোঝায়। কিন্তু, সমাজ সম্পর্কিত আলোচনায় যখন বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করা হয় তখন তার একটা সমষ্টিগত দিক থাকে। বৈচিত্র্য অর্থে এখানে এমন পার্থক্য বোঝান হয় যার ভিত্তিতে এক মানবগোষ্ঠী থেকে অন্য মানবগোষ্ঠীকে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করা যায়। এই পার্থক্য ব্যক্তি-ভিত্তিক (Individual-based) নয়, এ-হল গোষ্ঠী-ভিত্তিক (Group-based)।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। নানা সংস্কৃতি, নানা ভাষা, নানা মতের দেশ ভারতবর্ষ। প্রাকৃতিক পরিবেশগত বৈচিত্র্যের মতো এদেশের সমাজেও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। জাতিগোষ্ঠী, জাতপাত, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বৈচিত্র্যের অভিব্যক্তি বর্তমান। প্রকৃতপক্ষে এ এক বহুত্ববাদি সমাজ (plural society)।

এদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, বিশাল আয়তন, জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্য ভারতবর্ষকে 'পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র সংস্করণে' পরিণত করেছে। অধ্যাপক শ্যামাচরণ দুবের মতে, জাতি, ধর্ম ও ভাষা এই বহুত্ব বা বৈচিত্র্যের সবচেয়ে বড়ো উৎস।

১। জাতিগোষ্ঠীগত বৈচিত্র্য (Racial Diversities)

বি. এস. গুহ ভারতের জনসমষ্টির মধ্যে নেগ্রিটো, প্রটো-অস্ট্রলয়েড, মঙ্গলয়েড, মেডিটেরানিয়ান, ওয়েস্টার্ন ব্রাকিসেফালস ও নর্ডিক—এই ছয় প্রধান জাতিগোষ্ঠীর অবস্থান চিহ্নিত করেছেন। দক্ষিণ ভারতের কিছু অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে নেগ্রিটো বৈশিষ্ট্য আছে। এছাড়া ওঙ্গে ও আন্দামানিজদের মধ্যেও তা লক্ষ্য করা যায়। তুলনায় প্রটো-অস্ট্রলয়েড গোষ্ঠী সংখ্যায় অনেক বেশি দেখা যায়। মধ্যভারতে অনেক উপজাতি এই গোষ্ঠীভুক্ত। হিমালয় অঞ্চল ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের উপজাতিরা অধিকাংশ মঙ্গলয়েড গোষ্ঠীর মানুষ। দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মেডিটেরানিয়ানদের সম্পর্ক আছে মনে করা হয়। ওয়েস্টার্ণ ব্রাকিসেফালস আবার এলপাইনয়েড, দিনারিক ও আর্মেনয়েড—এই তিন উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে কিছু কিছু জনগোষ্ঠীর মধ্যে এলপাইনয়েড ও দিনারিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। পার্সিরা আর্মেনয়েড গোষ্ঠীভুক্ত। নর্ডিক বা ইন্দো-এরিয়ানরাই ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। তবে অধ্যাপক এস. সি. দুবের মতে, ভারতীয় জনসংখ্যার বৃহৎ অংশই বিভিন্ন জাতির মানুষের সংমিশ্রণে তৈরি।

২। ভাষাগত বৈচিত্র্য (Linguistic Diversity)

ভারতীয় সমাজে বৈচিত্র্যের অন্যতম উৎস হল ভাষা। ভারতবর্ষ বহু ভাষাভাষির দেশ। গ্রিয়ারসন (Grierson) এদেশে ১৭৯টি ভাষা (language) এবং ৫৪৪টি কথ্যরূপ (dialect) কে চিহ্নিত করেছেন। তবে সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে ১৬৫২টি ভাষা ও স্থানিক ভাষায় এ দেশের মানুষ কথা বলে। এই সবগুলি ভাষার ব্যবহার সমান নয়।

ভারতবর্ষের সংবিধানে প্রথমে ১৫টি ভাষা স্বীকৃত ছিল। ১৯৯২ সালে সংবিধানের ৭৭-তম সংশোধনীর ফলে কোঙ্কনি, মণিপুরি ও নেপালি ভাষা সরকারি তালিকায় যুক্ত হয়। এর ফলে ১৮টি ভাষা এখন সরকারিভাবে স্বীকৃত।

ভারতবর্ষের ভাষাগুলিকে ছয়টি ভাষাগোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়। এগুলি হল—নেগ্রয়েড, অস্ট্রিক, সিনো-টিবেটান, দ্রাবিড়িয়ান, ইন্দো-এরিয়ান এবং অন্যান্য। ভারতের ভাষাগুলির মধ্যে ইন্দো-এরিয়ান ভাষাগোষ্ঠী বৃহত্তম। ভারতীয় জনসংখ্যার ৭৪ শতাংশ মানুষ এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এর অন্তর্গত প্রধান প্রধান ভাষাগুলি হল—হিন্দি, বাংলা, মারাঠি, গুজরাতি, অসমীয়া, ওড়িয়া, রাজস্থানী, কাশ্মিরী ও সংস্কৃত। দ্রাবিড়িয়ান ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় জনসংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ মানুষ। এর অন্তর্গত প্রধান ভাষাগুলি হল—তেলেগু (অন্ধ্রপ্রদেশের সরকারি ভাষা), তামিল (তামিলনাড়ুর সরকারি ভাষা), কন্নড় (কর্ণাটকের সরকারি ভাষা) ও মালয়ালম (কেরালার সরকারি ভাষা)। ভাষাভিত্তিক রাজ্য

গঠনের নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে প্রধান আঞ্চলিক ভাষাগুলির সরকারি স্বীকৃতি অনিবার্য হয়ে পড়ে। সংবিধানের ৩৪৫ ধারা অনুযায়ী এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ভারতের সংবিধানে ৩৪৩ ধারা অনুযায়ী দেবনাগরী লিপি বিশিষ্ট হিন্দিকে রাষ্ট্রীয় ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং ৩৪৮ ধারা অনুযায়ী ইংরেজিকে আইন-আদালত ও সংসদীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়।

৩। ধর্মীয় বৈচিত্র্য (Religious Diversities)

ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এদেশে বহু ধর্মের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতবর্ষে ৮১.৪ শতাংশ মানুষ হিন্দু ধর্মাবলম্বী, ১২.৪ শতাংশ মানুষ মুসলমান, খ্রিস্টান অধিবাসীর সংখ্যা ২.৩ শতাংশ, শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা ১.৯ শতাংশ, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ০.৮ শতাংশ, জৈন ০.৪ শতাংশ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষ ০.৭ শতাংশ।

প্রধান প্রধান ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী আবার একাধিক উপগোষ্ঠীতে বিভাজিত। যেমন হিন্দু ধর্মে দেখা যায় শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব শ্রেণি। আর্য সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ প্রভৃতি ধর্মসংস্কার আন্দোলন আবার নতুন কিছু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটিয়েছে। আবার অনেক সময় দেখা যায় ধর্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সমিতিও গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষে ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এদেশে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জাতির ক্ষেত্রে না হলেও ভারতীয় সমাজে ধর্মীয় বিভাজনগুলি তুলনায় অনেকটাই স্পষ্টভাবে চিহ্নিত।

৪। নৃকূল বা জনগোষ্ঠীগত বৈচিত্র্য (Ethnic Diversity)

একই জাতি বা সাংস্কৃতিক পরম্পরাকে ভিত্তি করে নৃকূলগোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠী গড়ে উঠতে পারে। ভারতীয় সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে আদিবাসী, ভাষাগোষ্ঠী, ধর্মীয় গোষ্ঠী, আঞ্চলিক গোষ্ঠী এবং জাতি—এইসব ভিত্তি এতটাই পরস্পর নির্ভরশীল যে একটি অপরটির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। আদিবাসী গোষ্ঠীকে একই সাথে ভাষাগোষ্ঠী ও আঞ্চলিক গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। পল ব্র্যাস বস্তুগত ভিত্তিকে নৃকূলগত চেতনা বিকাশের পূর্ব শর্ত মনে করেন। একই ভাষা, ধর্ম কিংবা আঞ্চলিকতা নৃকূল গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে সমষ্টিগত মানসিকতা গড়ে তোলে। এই মানসিকতাই 'আমরা' বনাম 'ওরা'—এই গোষ্ঠীগত পার্থক্য সম্বন্ধে গোষ্ঠীসদস্যদের প্রভাবিত করে। কোনো চিহ্ন, প্রতীক, মিথ ইত্যাদিকে ভিত্তি করে এক নৃকূলগোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর পার্থক্য নির্দেশ করা হয়। ভাষা, পরিধান, খাদ্যরীতি ইত্যাদিতেও নৃকূলগোষ্ঠীগুলির সদস্যদের মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন নৃকুলগোষ্ঠীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এই গোষ্ঠীগুলি তাদের নিজস্ব আত্মপরিচয় (identity) গঠন করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। কখনো কখনো নৃকুলগোষ্ঠীগুলির মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ভারতীয় সমাজে নৃকুলগত দ্বন্দ্বের (ethnic conflict) সৃষ্টি করেছে।

৫। জাতপাতগত বৈচিত্র্য (Caste-based Diversity)

জাতপাতগত ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত বৈচিত্র্য ভারতীয় সমাজের অন্যতম প্রধান পরিচায়ক। এ হল এক বৈষম্য সৃষ্টিকারী ব্যবস্থা। ভারতবর্ষের জাতব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল এবং সুগঠিত। যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য ভারতীয় সমাজ ও ব্যবস্থাকে অন্য সমাজ ব্যবস্থাগুলি থেকে পৃথক হিসেবে উপস্থাপিত করে, জাত ব্যবস্থা এদের মধ্যে অন্যতম।

অধ্যাপক এম. এন. শ্রীনিবাসের মতে, জাত প্রথা এক সর্বভারতীয় ব্যবস্থা এই অর্থে যে এর মধ্যে সবার স্থানই জন্মসূত্রে নির্ধারিত, স্থানীয় গোষ্ঠীসমূহ এক-একটি বিন্যাস গঠন করে এবং তাদের সকলেই সাবেক যুগ থেকেই এক-একটা নির্দিষ্ট পেশার সঙ্গে যুক্ত। জাতপাত ব্যবস্থার অন্যতম সামাজিক বৈশিষ্ট্য হল অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহ (endogamy)।

বর্ণ ব্যবস্থার ভিত্তিতে ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসে জাতপাতের অবস্থান নির্ণয় করা হয়। ব্রাহ্মণ (পুরোহিত), ক্ষত্রিয় (যোদ্ধা), বৈশ্য (বণিক), শূদ্র (কৃষিজীবী, সেবামূলক কাজ) এবং জাত কাঠামোর বাইরে অস্পৃশ্য। ভারতবর্ষে জাতের সংখ্যা তিন সহস্রাধিক। মূলত হিন্দু ধর্মে জাতপাত ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও অন্যান্য ধর্মগুলির মধ্যেও জাতপাতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

৬। সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্য (Diversity of Culture)

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ও সম্প্রদায়ের জীবনধারার বৈচিত্র্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিভিন্ন অঞ্চলে পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও অঞ্চলের প্রথা, লোকাচার, লোকনীতি, শিল্পকলা ও স্থাপত্যের পার্থক্য ভারতবর্ষকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে।

☐ ঐক্যের ভিত্তি (Bases of Unity)

ভারতীয় সমাজ-সভ্যতার স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াসে ভিনসেন্ট স্মিথ লিখলেন—"বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য (Unity in Diversity)।" ভারতীয় স্বাদেশিকতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে এই বক্তব্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করল। এই বক্তব্যের সমর্থকদের মতে, ভারত সভ্যতা ঐতিহ্যগতভাবে সহনশীল। বিভিন্ন, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী জাতিগোষ্ঠীরাও এই 'পুণ্যভূমিতে' শান্তিতে সহাবস্থান করছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই মতের সমর্থক। ভারতীয় সমাজের সমন্বয় প্রচেষ্টার স্বরূপ উপলব্ধি করতে প্রথম থেকেই তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর মতে, ভারতে বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে

সাংস্কৃতিক সংহতি। প্রচুর বৈপরীত্য সত্ত্বেও অসংখ্য সেতুর বন্ধনে ঐক্য বিরাজ করছে। ভারতের সামাজিক কাঠামো ও আদান-প্রদানে এমন অনেক অভিন্নতার উপাদান আছে যা নিঃসন্দেহে ভারতীয়ত্বের লক্ষণযুক্ত। প্রথা, লোকাচার, লোকনীতি ও ধর্মের আশ্রয়ে সমাজজীবনের এইসব লক্ষণগুলি সুদূর অতীতকাল থেকেই এক 'অখণ্ড ভারতীয়তাকে' পরিপুষ্ট করে চলেছে বলে এই মতের সমর্থকরা মনে করেন। তাঁদের মতে, প্রাচীনকাল থেকেই সংস্কৃতি ও ভাবসমন্বয়ের ধারাটি ভারতের সমাজ জীবনে প্রবাহিত। মুসলিম আমলে মরমিয়া সুফি সাধক ও বৈষ্ণব ভক্তিবাদের প্রভাবে তা শক্তিশালী আন্দোলনের চেহারা পায়। অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরীর মতে, আসমুদ্র হিমাচল একটি দেশের কল্পনা ভারতবাসীর চিন্তায় বহুদিন ধরেই আছে। কিন্তু, জাতি ভিত্তিক একটা রাষ্ট্রের কথা আধুনিক যুগের আগে কখনো কেউ কল্পনা করেনি। সুরজিৎ দাশগুপ্তের মতে, সব ভারতীয় মিলে যে এক 'জাতি' এই বোধটা ব্রিটিশ শাসনের পরিণাম। তাঁর মতে, এক দেশ ও এক শাসনের ভিত্তিতেই সাধারণত 'এক জাতি' বোধের জন্ম হয়। ব্রিটিশ আমলে রেলওয়ে, প্রযুক্তি এবং ইংরেজি শিক্ষা এই বোধকে আরও শক্তিশালী করেছে।

রিসলের (Risley) মতে, ভাষাগত, ধর্মগত, প্রথাগত বৈচিত্র্যের অভ্যন্তরে উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতবর্ষে এক ঐক্য বিরাজ করছে। বহুবিধ সংস্কৃতির মিলনভূমি ভারতবর্ষ বিদেশী আক্রমণ ও শাসনের মধ্যেও তার ঐক্যকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। অধ্যাপক রাম আহুজা তাঁর 'ইন্ডিয়ান সোশ্যাল সিস্টেম' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে মূলগত ঐক্যবোধের সূত্রেই ভারতবর্ষ এক বৃহৎ সমাজে পরিণত হয়েছে এবং ভারতীয়দের এক মহাজাতি হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে।

১। ভৌগলিক বৈচিত্র্য ও ঐক্য

ভারতবর্ষের ভৌগলিক পরিবেশ তার ঐক্য ও সংহতিতে সহায়তা করেছে বলে মনে করা হয়। উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা ও অন্যদিকে সমুদ্র ভারতের অবস্থানগত স্বাতন্ত্র্যকে সুস্পষ্ট করেছে। এর ফলে এই দেশ বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেকে অনেকটাই রক্ষা করতে পারে। অখণ্ড ভারতবর্ষের ধারণা এর ফলে শক্তিশালী হয়েছে। হিমালয়ের কোলে বিভিন্ন অঞ্চল ভারতবাসীদের কাছে তীর্থক্ষেত্র। এই পর্বতমালা থেকে উৎসারিত হয়েছে অনেক নদী যা ভারতবাসীদের কাছে পবিত্র নদীর মর্যাদা পায়। গঙ্গা নদীর ঐক্য সঞ্চারী ভূমিকা সবাই স্বীকার করে। বয়ে চলার পথে এই নদী জমিকে উর্বর করেছে, সুজলা-সুফলা করেছে, বিভিন্ন জনপদ তৈরি করেছে—এইভাবে অসংখ্য ভারতবাসীর জীবন দান করেছে। এই কারণে গঙ্গা অধিকাংশ ভারতবাসীর কাছে দেবী হিসেবে পুজিত হয়। পালিত হয় গঙ্গা উৎসব। এছাড়াও অসংখ্য নদী, পবর্তমালা সমগ্র ভারতবর্ষকে সুসংহত রাখতে সহায়তা করছে।

২। ধর্ম ও ভারতীয় সমাজে ঐক্য

ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা সহাবস্থান করে আসছে। এর ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির পারস্পরিক আদান-প্রদান ঘটেছে। আত্তীকরণ (assimilation) ঘটার সহায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ভারতীয় সমাজের ঐক্য সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ধর্মের সদর্থক ভূমিকার কথা অনেকেই স্বীকার করে থাকেন। সমাজতাত্ত্বিক এম. এন. শ্রীনিবাসের মতে, ভারতবর্ষের ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি একে অন্যের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অনেক সময় অংশগ্রহণ করে, নিজেদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। ভারতীয় সমাজে ধর্ম ও পেশার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে মিল দেখা যায়। তবে বর্তমানে অর্থনৈতিক পেশার বৈচিত্র্য বাড়ছে। এর ফলে বিশেষ ধর্মের সঙ্গে নির্দিষ্ট পেশার যোগাযোগ ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধানে অ্যানথ্রোপলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া থেকে ৪৬৩৫টি সম্প্রদায়ের মধ্যে এক বিশদ সমীক্ষা করা হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে ভারতে ৮৭টি সম্প্রদায় হিন্দু ও শিখ, ১১৬টি সম্প্রদায় হিন্দু ও খ্রিস্ট, ৩৫টি সম্প্রদায় হিন্দু ও ইস্‌লাম, ২১টি সম্প্রদায় হিন্দু ও জৈন এবং ২৯টি সম্প্রদায় হিন্দু ও বৌদ্ধ—এই দুটি করে ধর্মের আচার-সংস্কার একই সাথে পালন করেন।

ধর্মভিত্তিক ঐক্যের স্বরূপ সন্ধানে ভারতীয় সমাজে তীর্থ যাত্রার ভূমিকার কথা উল্লেখ করা যায়। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিভিন্ন ধর্মের অসংখ্য তীর্থস্থান আছে। বিভিন্ন ধর্মের মানুষের কাছে তীর্থযাত্রা জীবনের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভারতের বিভিন্ন অংশে অন্য অঞ্চলের মানুষের পরিভ্রমণ ভারতবর্ষের ঐক্যকে দৃঢ় করেছে।

৩। ভাষা ও ভারতীয় সমাজে ঐক্য

অধিকাংশ সমাজতাত্ত্বিক এই বিষয়ে একমত যে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতের মানুষের মধ্যে অভিন্ন ভাষাভাষী হওয়ার কারণে এক ঐক্যবোধ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এই ঐক্যবোধের ধরন উল্লম্ব প্রকৃতির। অধ্যাপক রাম আহুজার মতে, একটি ভাষাগত অঞ্চলে (linguistic area) এক উল্লম্ব প্রকৃতির ঐক্য (vertical unity) বিরাজ করে। ব্রাহ্মণ থেকে অস্পৃশ্য অবধি বিভিন্ন জাতের মানুষের মধ্যে একটি সাধারণ ভাষার কল্যাণে তাদের মধ্যে এক উল্লম্ব প্রকৃতির ঐক্য সৃষ্টি হয়।

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ভাষাগুলি মোটামুটি দুটি মূল ভাষা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এই দুটি মূল ভাষা হল ইন্দো-ইউরোপীয় ও দ্রাবিড়িয়। প্রাচীন যুগে পালি ও প্রাকৃত ভাষার প্রচলন ছিল বেশি। হিন্দু সংস্কৃতির ভিত্তি হিসেবে সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচলন ছিল।

অ্যানথ্রোপলজিকাল সার্ভে সংস্থার ভাষা সম্পর্কিত সমীক্ষাও চমকপ্রদ তথ্য সরবরাহ করেছে। সমীক্ষকদের মতে, পাশাপাশি বসবাস করার ফলে ও ব্যাপক যোগাযোগের সুবাদে একটি ভাষা অন্য ভাষার শব্দই শুধু গ্রহণ করেছে তা নয়, সেই ভাষার কাঠামোতেও

পরিবর্তন ঘটছে। ভারতবর্ষে দ্বিভাষী মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই দেশে দ্বিভাষী মানুষের সংখ্যা বর্তমানে ৬৪.২ শতাংশ। সমীক্ষকরা মনে করেন, ভারতবর্ষে প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যে মিশ্রণ ঘটছেই এবং তার ফল ভারতীয় সমাজের ঐক্যের পক্ষে শুভ হতে বাধ্য।

৪। বহুত্ববাদ ও ভারতীয় সমাজে ঐক্য

অ্যানথ্রোপলজিকাল সার্ভের সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থ-সামাজিক আদান-প্রদান আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। আঞ্চলিক আবেগ, সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা আছে, তবু এসবকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে সমন্বয়ী মানসিকতা। কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানীর মতে, ভারতীয় জনগোষ্ঠী একই সাথে আঞ্চলিক ও সর্বভারতীয়। অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়ের মতে, বৈচিত্র্য মানে বিরোধ নয়। বৈচিত্র্য তখনই বিরোধ হয়ে দাড়ায় যখন একটা কাঠামোর মধ্যে সবাইকে ধরাবার চেষ্টা হয় এবং সেটা করে কোনো বিশেষ একটা সংগঠিত গোষ্ঠী। অধ্যাপক বরুণ দে মনে করেন, ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যের মধ্যে যদি কোনো একটা একক কাঠামো বসানোর চেষ্টা হয় তখনই তা জাতীয় সংহতির সমস্যা সৃষ্টি করে। তাঁর মতে, সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের মধ্যেই অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রকৃত অস্তিত্ব।

ভারতবর্ষের ঐক্য ব্রিটিশ শাসনেরই ঐক্য সঞ্চারী প্রভাবের ফল—একথা অনেকেই বলে থাকেন। ঔপনিবেশিক শোষণের স্বার্থে ব্রিটিশদের প্রয়োজন ছিল একই অর্থনীতি ও প্রশাসনের আওতাধীন অখণ্ড ভারতবর্ষের। কিন্তু, দেশ শাসনের স্বার্থে তাঁদের প্রয়োজন ছিল দুর্বল ভারতবর্ষের যেখানে বিভিন্ন জাতিসত্তাগুলির মধ্যে থাকবে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সংঘাত। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর অনৈক্যকে ইন্ধন দিয়ে 'বিভাজন ও শাসন'ই ছিল ব্রিটিশ সরকারের মূল লক্ষ্য। নাম্বুদিরিপাদের মতে, ব্রিটিশ যুগে ভারতে যে প্রশাসনিক ঐক্য গড়ে তোলা হয়েছিল তা পৃথক পৃথক জাতিসত্তার স্বতন্ত্র বিকাশকে অবরুদ্ধ করেছিল। অমলেন্দু গুহর মতে, এই প্রশাসনিক ঐক্যর ফলে জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির বাস্তব ভিত্তি তৈরি হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গড়ে উঠল সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ঐক্য। এর ফলে তৈরি হল সর্বভারতীয় স্তরের জাতীয়তা। আবার একই সাথে রইল নিজস্ব জাতিসত্তার আত্মপরিচয়কে ভিত্তি করে আগে থেকেই গড়ে ওঠা 'আঞ্চলিক স্তরের জাতীয়তা'।

❑ উপসংহার

ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় অর্থনীতিতে তৈরি করেছিল আঞ্চলিক অসাম্য, স্বাধীন ভারতবর্ষে এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল না। বরঞ্চ, আন্তরাজ্য, আন্তর্গোষ্ঠী বৈষম্য বৃদ্ধিই পেল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন 'বঞ্চিত' সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অসন্তোষ বাড়ল।

অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের মতে, উত্তর স্বাধীনতাকালে যে সব ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের যে সীমাহীন ঐক্যের কথা আগে বলা হত তা আসলে অতি সরলতা দোষে দুষ্ট ছিল। বীণা দাস তাঁর গবেষণাভিত্তিক রচনায় মত প্রকাশ করেছেন যে সমসাময়িক নৃতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের ঐক্য সন্ধানী বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনায় বৈচিত্র্যমূলক উপাদানগুলির ওপর অনেক বেশি জোর না দিয়ে উপায় নেই। অধ্যাপক টি. কে. উমেনও মনে করেন, ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্যের চরিত্র ছিল স্পষ্টতঃ রাজনৈতিক। স্বাধীনতা অর্জনের পর তার প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়েছে। এখন জাতীয় ঐক্যের সাংস্কৃতিক উপাদান তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্ব লাভ করেছে। ভারতবর্ষের মতো বহুত্ববাদী সমাজে (plural society) বৈচিত্র্য ও বিকেন্দ্রীকরণকেই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি করা প্রয়োজন। যেখানে কোনো সামাজিক গোষ্ঠীই নিজেদের বঞ্চিত মনে করবে না—আত্মপরিচয়ের সমস্যায় ভুগবে না। ঐক্য এবং বৈচিত্র্যের পারস্পরিক ভারসাম্যের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠতে পারে এক শক্তিশালী অখণ্ড ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির সমস্যা
(Problems Of National Unity And Integration In India)

ভারতবর্ষের সমাজ বহুত্ববাদী (Plural Society)। এখানে বহু জাতি, শ্রেণি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে সিমলার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব এ্যাডভান্সড্ স্টাডিতে অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু তাঁর বক্তৃতামালায় জাতীয় সংহতির বিভিন্ন সমস্যার ওপর আলোকপাত করেন। তাঁর মতে, বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের সীমা ছাড়িয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করছে এবং তার প্রতিফলন হয়েছে সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনগুলিতে। তিনি মনে করেন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিসত্তাগুলির অসম অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের অসামঞ্জস্যগুলিই আক্রোশ ও হিংসাতে তথা জাতীয় সংহতির সমস্যাতে পরিণত হয়েছে। অধ্যাপক কে. এল. শর্মার মতে, জাতীয় সংহতির সমস্যার উদ্ভব অংশত ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ থেকে এবং অংশত বেশ কিছু সামাজিক গোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ের সমস্যা থেকে। তুলনামূলকভাবে দরিদ্র ও পশ্চাদপদ কিছু কিছু সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্যরা নিজেদের 'দ্বিতীয় শ্রেণির' নাগরিক ভাবতে শুরু করে। অন্যদিকে, কিছু সামাজিক গোষ্ঠী জনসংখ্যা, অর্থ, রাজনৈতিক ক্ষমতা, শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে নিজেদের শক্তিশালী ও আধিপত্যকারী মনে করতে শুরু করে। পরস্পরবিরোধী সমষ্টিগত মানসিকতার মধ্যকার এই দ্বন্দ্বগুলিই ভারতবর্ষের ঐক্য ও জাতীয় সংহতির সবচেয়ে বড়ো সমস্যা।

❑ সাম্প্রতিক জাতীয় রাজনীতি ও বহুত্ববাদ

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর জাতীয় সংহতি সমস্যা সম্পর্কিত বক্তৃতামালার সময়কাল থেকে উত্তরোত্তর সমস্যাগুলি আরও ব্যাপক ও জটিল আকার ধারণ করেছে। ভারতবর্ষের জনসমাজে যে বিভিন্নতা, বৈচিত্র্য এমনকি বৈপরীত্য রয়েছে সাম্প্রতিক জাতীয় রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে সেই বহুত্ববাদ ও বহুমাত্রিকতার প্রতিফলন ঘটতে শুরু করেছে। কেন্দ্রে সরকার গঠন কিংবা পতনে ছোটো এবং আঞ্চলিক দলগুলির ভূমিকা উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কোথাও এই দল প্রাদেশিকতার প্রতিনিধি, কোথাও যাদব, কুর্মি বা অন্যকোনো

জাতভুক্তদের গোষ্ঠীস্বার্থের, কখনো জাঠ কৃষকের শ্রেণি স্বার্থের কিংবা কোথাও ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও দলিত শ্রেণির সমানাধিকার ও স্বাধিকারের প্রতিভূ।

ভাবগত ঐক্য ও জাতীয় সংহতি

অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরীর মতে, আসমুদ্রহিমালয় একটি দেশের কল্পনা ভারতবাসীর চিন্তায় বহুদিন ধরে আছে। কিন্তু, জাতিভিত্তিক একটি রাষ্ট্রের কথা আধুনিক যুগের আগে কখনো কেউ কল্পনা করেনি। ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির স্বরূপ উন্মোচন প্রয়াসে ভিনসেন্ট স্মিথের 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'র ধারণা ভারতীয় স্বাদেশিকতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই ধারণার সমর্থকদের মতে, ভারত সভ্যতা ঐতিহ্যগতভাবে সহনশীল। বিভিন্ন এবং অনেকক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধীরাও এই 'পূণ্যভূমিতে' শান্তিতে সহাবস্থান করছে। অধ্যাপক রায়চৌধুরীর মতে, এই আদর্শগত ধারণার ভিত্তিতেই 'জাতীয়তাবাদী' ভারতবাসী নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানীর মতে, দেশের শাসক শ্রেণি জাতীয় সংহতির প্রশ্নটিকে শুধুমাত্র 'ভাবগত ঐক্যের'র বিষয় হিসেবে তুলে ধরতে চাইছেন। তাঁদের মতে, আপামর ভারতবাসীর মধ্যে 'আমরা-বোধ' তৈরি করতে পারলেই সমস্যার সমাধান সম্ভব। এ ধরনের সমাধান ভাবনা, অনেকের মতে, অতি সরলীকরণ দোষে দুষ্ট। বিষয়টিকে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীতে জাতি সমস্যার সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে বিচার করতে হবে।

জাতীয়তাবোধ—সর্বভারতীয় ও আঞ্চলিক

অধ্যাপক বরুণ দে'র মতে, 'জাতি'র অনেক ধরনের সংজ্ঞা আছে। হিন্দু সমাজের ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'জাতি'র অর্থ ইংরেজির সাব-কাস্টের অনুরূপ। আরবি ভাষায় 'জাতি' বলতে কৌম কে বোঝায়। ব্রিটিশ আমলে 'জাতি'কে 'নেশনের' সমার্থক হিসেবে ধরা যায়। অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়ের মতে, ইংরেজিতে যাকে 'নেশন' বলে ভারতবর্ষে তা কোনোদিনই ছিল না। অধ্যাপক এ. আর. দেশাইয়ের মতে, ঊনিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। ঔপনিবেশিক শোষণের সুবিধার জন্য খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারতকে জাতীয় অর্থনীতি ও একই প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় আনতে চেয়েছিল ব্রিটিশরা। এরই ফলে 'জাতীয়তাবাদ' সৃষ্টির বাস্তব উপাদান তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে। ভারতবর্ষের মানুষের জাতীয়তাবোধ একই সাথে সর্বভারতীয় ও আঞ্চলিক রূপ পরিগ্রহ করল। ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে গড়ে উঠল সর্বভারতীয় স্তরের জাতীয়তা। অন্যদিকে রইল নিজস্ব জাতিসত্তার পরিচয়কে ভিত্তি করে আগে থেকেই গড়ে ওঠা আঞ্চলিক 'জাতীয়তাবোধ'।

ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা

অধ্যাপক যোগেন্দ্র সিং-এর মতে, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাই ভারতবর্ষে জাতীয় সংহতির

সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। ভারত শাসনের স্বার্থে ব্রিটিশদের প্রয়োজন ছিল পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সংঘাতপূর্ণ দুর্বল ভারতবর্ষের। বিভাজন ও শাসনই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। ব্রিটিশ সরকার দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রয়োগ করলে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থপর আঁতাত ভারতবর্ষকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করতে সফল হয়। দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্য তখন থেকেই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির প্রভাবে হিন্দু ও মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক জটিল ও বিপজ্জনক আকার ধারণ করে।

রজনী কোঠারীর মতে, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদের অন্যতম শক্তিশালী অবলম্বন রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের কর্ণধাররা অনেক সময় রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে বিশেষ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন। স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি থাকলেও মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান প্রভৃতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অনেক সময় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বৃদ্ধি পায়। দেশের ঐক্য ও জাতীয় সংহতির সমস্যা ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

❑ ভাষা সমস্যা

ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যের অন্যতম ভিত্তি হল ভাষা। ব্রিটিশ আমলেই ভারতবর্ষে ভাষা নিয়ে সুবিধাবাদী রাজনীতি শুরু হয়। স্বাধীন ভারতবর্ষের জনগণনায় ১,৬৫২টি মাতৃভাষার সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে অন্তত এক লাখের অধিক মানুষের জনগোষ্ঠী কথা বলে এমন ভাষার সংখ্যা তেত্রিশটি। ১৯৯২ সালে কোঙ্কনি, মণিপুরি, ও নেপালি ভাষা সরকারি তালিকায় যুক্ত হওয়ার পর বর্তমানে ১৮টি ভাষা সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছে। সংবিধানের ৩৪৩ ধারায় হিন্দিকে রাষ্ট্রীয় ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। রাষ্ট্রভাষা হওয়ার সুবাদে হিন্দি সবচেয়ে বেশি সরকারি আনুকূল্য পায়। ভারতবর্ষের ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে একভাষা সূত্র অন্যান্য ভাষা-ভাষী মানুষের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করে। পঞ্চাশের দশকে দক্ষিণ ভারতে আন্দোলন শুরু হয়। সম্প্রতি তামিলনাড়ুর অন্যতম প্রধান আঞ্চলিক দলের নেত্রী তামিল ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছেন। এর থেকে অনেকটা বোঝা যায় যে হিন্দিকে একমাত্র 'রাষ্ট্র ভাষার' মর্যাদা দিয়ে ভারতবর্ষের বহুভাষী সমাজে ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস তেমন সাফল্য লাভ করতে পারেনি। কারো কারো মতে, সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত আঠারোটা ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে হলে জাতীয় স্তরে প্রশাসন পরিচালনা করা কঠিন হবে। আঞ্চলিকতাবাদ বৃদ্ধি পাবে। দেশের অনৈক্য বাড়বে। আবার অন্যপক্ষের মতে, প্রাদেশিক ভাষার ব্যাপক 'রাষ্ট্রীয়' মর্যাদা লাভে প্রাদেশিক আত্মাভিমান তুষ্ট হবে। এর ফলে বহুত্ববাদী ভারতীয় সমাজে ঐক্য ও জাতীয় সংহতি আরও দৃঢ় হবে।

জাতিসত্তাগত সমস্যা

নাম্বুদিরিপাদের মতে, ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে যে প্রশাসনিক ঐক্য গড়ে তোল হয়েছিল তা পৃথক পৃথক জাতিসত্তার স্বতন্ত্র বিকাশকে অবরুদ্ধ করেছিল। স্বাধী ভারতবর্ষেও এই অবস্থার তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি। ভারতবর্ষ আজ বিভি জাতিসত্তাগত সমস্যার সম্মুখীন। ডঃ এম এস প্রভাকর মন্তব্য করেছেন—অসম, উত্ত পূর্বের অনেক অঞ্চল এবং দেশের অন্যান্য অনেক অংশে বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ হল, যে সব গোষ্ঠী দ্বারা ভারতবর্ষ গঠিত তারা অনেকেই তাদের জাতিসত্তাগ বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিপন্ন মনে করেছে। এরই ফলে, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীগুলি ক্রমান্বয়ে রক্ষামূলক ব্যবস্থা, বিশেষ ব্যবস্থা আবার অনেকে চূড়ান্তভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দা করেছে। দেশ-বিদেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতিকে বিপন্ন করতে চাইছে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে নানাভাবে মদত দিচ্ছে।

জাতপাতের রাজনীতি

অধ্যাপক এস. সি. দুবের মতে, স্বাধীনতা উত্তর কালে ভারতবর্ষে জাতপাতের রাজনীতি ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়েছে। প্রতিটি নির্বাচনে উত্তরোত্তর এর গুরুত্ব বেড়ে চলেছে। নিজেদে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রায় সব রাজনৈতিক দ জাতপাতকে কাজে লাগাচ্ছে। সংসদীয় রাজনীতিতে ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যেই রাজনৈতি দলগুলি কম-বেশি এ কাজ করছে। ১৯৯০ সালে ভি. পি. সিং মণ্ডল কমিশনের সুপারিশগু গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। এর পক্ষে-বিপক্ষে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আন্দোলন এমনি আত্মহুতি পর্ব চলতে থাকে। রাজনৈতিক দলগুলির মেরুকরণও সংরক্ষণের রাজনীতি ভিত্তিতে চলতে থাকে। কোথাও কোথাও সমাজের অনগ্রসর শ্রেণির ক্রমবর্ধমান রাজনৈতি প্রতিপত্তিকে খর্ব করতে একাধিক 'উঁচু জাত' নিজেদের মধ্যে সমঝোতা তৈরি করছে রাজনীতির এই প্রবণতা জাতগুলির মধ্যে সম্পর্ক বিষিয়ে তুলছে যা ভারতীয় সমাজের ঐক্য ও জাতীয় সংহতির পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে।

অতিকেন্দ্রিকতা ও অসম আর্থিক বিকাশ

এন. রামের মতে, অতিকেন্দ্রিকতা ও জাতীয় সংহতির সংকটের মধ্যে এক পারস্পরি সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। 'যুক্তরাষ্ট্রীয়' কাঠামোর কথা স্বাধীনতার সময়কালে শো গিয়েছিল। কিন্তু, সর্বক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অসম আর্থি বিকাশের দরুণ দেশের বহু অঞ্চলের মানুষ অনগ্রসর হয়ে থাকল। বেকারত্ব, দারি নিরক্ষরতা, অপুষ্টিতে ভরা তাঁদের জীবন-মানে স্বাধীনতা তেমন কিছু পরিবর্তন ব আনতে সক্ষম হল না। পার্থসারথি গুপ্তর মতে, কোনো অঞ্চলের মানুষের মধ্যে যদি এক

ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে যোজনা কমিশন, অর্থ কমিশন, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় নিয়োগ আয়োগ ইত্যাদি সংস্থা তাদের প্রতি ক্রমাগত বৈষম্যমূলক আচরণ করে চলছে, তবে 'স্থানীয় জাতীয়তাবাদ' জন্ম নিতে পারে। অধ্যাপক শ্রীনিবাসের মতে, প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ অনেক ক্ষুদ্র অঞ্চলের (micro-regions) সমাহার। জাতীয় সংহতির স্বার্থে অঞ্চলগুলির মধ্যেকার বৈষম্য কমানো প্রয়োজন। এই জন্য অঞ্চলগুলির চাহিদা ও বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দিয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণের বিকেন্দ্রীকরণ করা দরকার।

☐ দুই দৃষ্টিভঙ্গী—রাষ্ট্রবাদী ও জাতিসত্তাবাদী

অধ্যাপক টি. কে. উমেন জাতীয় ঐক্য ও সংহতির দুই পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর কথা উল্লেখ করেছেন—রাষ্ট্রবাদী ও জাতিসত্তাবাদী। প্রথমোক্তদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অখণ্ডতার প্রশ্নটিই মূল বিবেচ্য। শেষোক্তরা যে কোনো মূল্যে বিভিন্ন জাতিসত্তাগুলির সাংস্কৃতিক বিশুদ্ধতা রক্ষার বিষয়টিকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন।

অতিকেন্দ্রিকতা ও এক সংস্কৃতির 'রাষ্ট্রবাদী' প্রবক্তারা এবং অন্যদিকে জাতিগত সংকীর্ণতা ও উগ্রজাত্যাভিমানী 'জাতিসত্তাবাদীরা'—উভয়েই ভারতবর্ষের ঐক্য ও জাতীয় সংহতির পথে সমস্যা সৃষ্টি করেছে। প্রথমোক্তরা জাতিসত্তা বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে ভারতীয় সমাজের স্বাভাবিক বৈচিত্র্যকে বিলুপ্ত করতে চাইছে। শেষোক্তরা সংকীর্ণ অঞ্চলিক স্বার্থকেই সর্বদা দেশের সামগ্রিক স্বার্থের চেয়ে বড়ো করে দেখতে চাইছে। উভয়েই নিজস্ব পথে ভারতবর্ষের ঐক্য বিপন্ন করে তুলছে।

☐ বৈচিত্র্য ও বিকেন্দ্রীকরণ

সমাজতাত্ত্বিক টি. কে. উমেনের মতে, মানুষের জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনগুলি শুধুমাত্র আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর সাথে নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) সম্পর্ক যুক্ত হয়ে থাকতে পারে না। পরিবার, আত্মীয়-পরিজনের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে তাঁর জীবনের বিভিন্ন অভিব্যক্তিগুলি প্রকাশ পায়। এই দুয়ের মধ্যবর্তী পর্যায়ের সম্পর্ক কাঠামো নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তিগত সত্তার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, ভাষা এই পর্যায়ের ভূমিকা পালন করে আসছে। মানুষের এই বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাভাবিক আনুগত্যের পরিপ্রেক্ষিত আলাদা আলাদা। এদের অনায়াস সহাবস্থান সম্ভব। স্বাধীনতার সময়কাল থেকে শুধুমাত্র 'জাতীয়-রাষ্ট্রের' নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্ক কাঠামোকে ভিত্তি করেই জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল। উল্টে, তা বিভিন্ন পর্যায়ের সম্পর্ক কাঠামোর পারস্পারিক ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার পথে বাধা সৃষ্টি করে।

ভারতবর্ষের মতো বহুত্ববাদী সমাজে বৈচিত্র্য ও বিকেন্দ্রীকরণকেই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি করতে হবে। যেখানে কোনো জাতিসত্তাই আত্মপরিচয়ের সমস্যায় ভুগবে না। কোনো অঞ্চলই নিজেদের বঞ্চিত মনে করবে না। বৈচিত্র্য ও বিকেন্দ্রীকরণকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়েই গড়ে উঠতে পারে এক শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ।